হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

মাননীয় এমাম, হেযবুত তওহীদ

লেখক পরিচিতি:

তিনি যতগুলো বই লিখেছেন সবই আত্মার তাগিদে, সমাজ পরিবর্তনের মানসে। জন্ম স্বাধীনতার পরে ১৯৭২ সনে। নোয়াখালীর সোনাইমুড়িতে কেটেছে শৈশব। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বি.এস.এস পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৮ সনে হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা এমামুযযামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর সংস্পর্শে আসেন। ২০১২ সনে এমামুযযামানের আল্লাহর সান্নিধ্যে গমনের পর থেকে তিনি হেযবুত তওহীদের এমাম হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে হেযবুত তওহীদ মানবতার কল্যাণে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামের প্রকৃত রূপ মানুষের সামনে তুলে ধরছে।

সওম শব্দের অর্থ বিরত থাকা অর্থাৎ আত্মসংযম (Self Control)। মো'মেন সারাদিন সওম রাখবে অর্থাৎ পানাহার ও জৈবিক চাহিদাপূরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, আত্মাকে করবে শক্তিশালী। সে অপচয় করবে না, মিথ্যা বলবে না, পশুর মতো উদরপূর্তি করবে না। সে হবে নিয়ন্ত্রিত, ত্যাগী, নিজের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গকারী এবং আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে সজাগ। তার এই চরিত্রের প্রতিফলন ঘটবে জাতীয়, সামাজিক ও সামষ্টিক জীবনে। ফলে এমন একটি সমাজ গড়ে উঠবে যেখানে সবাই এক অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে উৎসাহী হবে। সেখানে বিরাজ করবে সহযোগিতা ও সহমর্মিতা। কিন্তু বর্তমান সমাজে আমরা এর উল্টো চিত্রটি দেখতে পাই। রমজান আসলেই সমস্ত মুসলিম বিশ্বে হুলুস্থুল পড়ে যায়। ব্যাপক প্রস্তুতি চলতে থাকে ঘরে ঘরে। এত রোজা রাখার পরও মানুষ এখানে আত্মকেন্দ্রিক এবং স্বার্থপর। তারা আল্লাহর হুকুম দিয়ে সমাজ পরিচালিত করে না। প্রতি বছর মুসলিম বিশ্বে সওম পালিত হচ্ছে, তারা নাকি খাদ্যগ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করছেন। প্রশ্ন হলো, যদি নিয়ন্ত্রণই করে থাকেন তাহলে প্রতি বছর রমজান মাসে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি কেন হয়? আমাদের সমাজে অন্যায় অবিচার অন্য মাসের মতোই চলমান থাকে কেন? সত্যমিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের বোধ (তাকওয়া) যখন সৃষ্টি হচ্ছে না, তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে আমাদের সওম হচ্ছে না। কারণ সওমের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাকওয়া সৃষ্টি (সুরা বাকারা ১৮৩)। সওম যে হবে না এ কথাটিই রসুলাল্লাহ (সা.) বলেছেন, এমন সময় আসবে যখন মানুষ সওম রাখবে কিন্তু সেটা না খেয়ে থাকা হবে। এই বইটির অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে লেখক এ বইতে সওমের খুঁটিনাটি মাসলা মাসায়েলের বিবরণী নয়, বরং এতে সওমের মূল উদ্দেশ্য (আকিদা) কী এবং কার সওম কবুল হবে সেটাই তুলে ধরেছেন।

সওমের উদ্দেশ্য

SELF-CONTROL

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

সওমের উদ্দেশ্য

হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম
এমাম, হেযবুত তওহীদ

প্রকাশক:
তওহীদ প্রকাশন
৩১/৩২, পি.কে. রায় রোড,
পুস্তক ভবন, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন: ০১৬৭০-১৭৪৬৪৩, ০১৬৭০-১৭৪৬৫১
www.hezbuttawheed.org
ফেসবুক: আসুন সিস্টেমটাকে পাল্টাই; Let's change the system
প্রকাশকাল: ৩০ জুন ২০১৬
ISBN: 978-984-8912-40-9

মূল্য: ২০.০০ টাকা

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

রোজা নয়, সওম

এ উপমহাদেশে সওম বা সিয়ামের বদলে রোজা শব্দটা ব্যবহারে আমরা এতটা অভ্যস্ত হয়ে গেছি যে, সওম বললে অনেকে বুঝিই না সওম কী। কোর'আনে কোথাও রোজা শব্দটা নেই কারণ কোর'আন আরবি ভাষায় আর রোজা পার্শি অর্থাৎ ইরানি ভাষা। শুধু ঐ নামাজ, রোজা নয় আরও অনেক শব্দ আমরা ব্যবহার করি যা কোর'আনে নেই। যেমন খোদা, বেহেশত, দোজখ, ফেরেশতা, জায়নামাজ, মুসলমান, পয়গম্বর, সিপারা ইত্যাদি। এই ব্যবহার মুসলিম দুনিয়ায় শুধু ইরানে এবং আমাদের এই উপমহাদেশে ছাড়া আর কোথাও নেই। এর কারণ আছে। কারণটা হলো - ইরান দেশটি সমস্তটাই অগ্নি-উপাসক ছিল। প্রচণ্ড শক্তিশালী, অন্যতম বিশ্বশক্তি ইরান ছোট্ট উম্মতে মোহাম্মদীর কাছে সামরিক সংঘর্ষে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়ে গিয়েছিল। পরাজিত হবার পর প্রায় সমস্ত ইরানি জাতিটি অল্প সময়ের মধ্যে পাইকারিভাবে দীন ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়ে গিয়েছিল। এই ঢালাও ভাবে মুসলিম হয়ে যাবার ফলে তারা ইসলামের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা পূর্ণভাবে বুঝতে সমর্থ হলো না অর্থাৎ তাদের আকিদা সঠিক হলো না। তারা ইসলামে প্রবেশ করলো কিন্তু তাদের অগ্নি-উপাসনার অর্থাৎ আগুন পূজার সময়ের বেশ কিছু বিষয় সঙ্গে নিয়ে ইসলামে প্রবেশ করলো। ইরানীরা আগুন উপাসনাকে তারা নামাজ পড়া বলতো, সালাহ্-কে তারা নামাজ বলতে শুরু করলো, তাদের অগ্নি-উপাসনার ধর্মে উপবাস ছিল, তারা সওমকে রোজা অর্থাৎ উপবাস বলতে লাগলো, মুসলিমকে তারা পার্শি ভাষায় মুসলমান, নবী-রসুলদের পয়গম্বর, জান্নাতকে বেহেশত, জাহান্নামকে দোজখ, মালায়েকদের ফেরেশতা, আল্লাহকে খোদা ইত্যাদিতে ভাষান্তর করে ফেললো। শুধু যে সব ব্যাপার আগুন পূজার ধর্মে ছিল না, সেগুলো স্বভাবতই আরবি শব্দেই রয়ে গেল; যেমন যাকাত, হজ্ব ইত্যাদি। তারপর মুসলিম জাতি যখন ভারতে প্রবেশ করে এখানে রাজত্ব করতে শুরু করলো তখন যেহেতু তাদের ভাষা পার্শি ছিল সেহেতু এই উপমহাদেশে ঐ পার্শি শব্দগুলোর প্রচলন হয়ে গেল। এক কথায় বলা যায় যে, আরবের ইসলাম পারস্য দেশের ভেতর দিয়ে ভারতে, এই উপমহাদেশে আসার পথে পার্শি ধর্ম, কৃষ্টি ও ভাষার রং-এ রঙিন হয়ে এল।

সওমের আকিদা

ইসলামের যেমন একটা উদ্দেশ্য আছে, তেমনি ইসলামের সকল হুকুম আহকামেরও প্রত্যেকটার আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য আছে। সত্যদীন, দীনুল হক অর্থাৎ ইসলাম আল্লাহ কেন দিলেন, কেতাব কেন নাযিল করলেন, নবী-রসুলদেরকে কেন পাঠালেন ইত্যাদি সমস্ত কিছুরই উদ্দেশ্য আছে।

আসমান-জমিন, গ্রহ-নক্ষত্র কোনো কিছুই যেমন উদ্দেশ্যহীনভাবে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেন নি তেমনি মানুষকেও একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন। যে কোনো বিষয়ের উদ্দেশ্য জানাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে কোনো আমল করার আগে কাজটি কেন করবো এই উদ্দেশ্য জানা প্রত্যেকের জন্য অত্যাবশ্যক। সঠিকভাবে উদ্দেশ্যটা জেনে নেওয়াই হলো আকিদা সঠিক হওয়া। সমস্ত আলেমরা একমত যে আকিদা সহীহ না হলে ঈমানের কোন মূল্য নেই। এই আকিদা হলো কোনো একটা বিষয় সম্বন্ধে সঠিক ও সম্যক ধারণা (ঈড়সঢ়ৎবযবহংরাব ঈড়হপবঢ়ঃ, ঈড়ৎৎবপঃ ওফবধ)। ইসলামের একটা বুনিয়াদী বা ফরজ বিষয় হলো সওম বা রোজা। পূর্বের অন্যান্য ধর্মগুলোর মধ্যেও উপবাস ব্রত (ঋধংঃরহম) পালনের বিধান ছিল যা বর্তমানে সঠিকরূপে নেই। ইসলামের বেলাতেও একই ঘটনা ঘটেছে। কাজেই মো'মেনদেরকে অবশ্যই সওমের সঠিক আকিদা জানতে হবে। প্রথমত জানতে হবে সওম বা রোজা কার জন্য।

সওম কার জন্য?

সওমের নির্দেশ এসেছে একটি মাত্র আয়াতে, সেটা হলো- "হে মো'মেনগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মতো তোমাদের উপরও সওম ফরদ করা হয়েছে, যাতে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হতে পার (সুরা বাকারা-১৮৩)।" পাঠকগণ খেয়াল করুন, সওমের নির্দেশনাটা কিন্তু মো'মেনদের জন্য, আয়াতটি শুরু হয়েছে 'হে মো'মেনগণ' সম্বোধন দিয়ে। আল্লাহ কিন্তু বলেন নি যে হে মানবজাতি, হে বুদ্ধিমানগণ, হে মুসুল্লিগণ ইত্যাদি। তার মানে মো'মেনরা সওম পালন করবে। তাহলে মো'মেন কারা? আল্লাহ সুরা হুজরাতের ১৫তম আয়াতে বলেছেন, তারাই মো'মেন যারা আল্লাহ ও রাসুলের উপর ঈমান আনে, কোনো সন্দেহ পোষণ করে না এবং সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে। তারাই সত্যনিষ্ঠ মো'মেন। এই সংজ্ঞা যে পূর্ণ করবে সে মো'মেন। আমরা সংজ্ঞায় ২টি বিষয় পেলাম। এক, আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান অর্থাৎ আল্লাহর সার্বভৌমত্ব। যে বিষয়ে আল্লাহ ও রসুলের কোনো হুকুম আছে সেখানে আর কারো হুকুম মানা যাবে না। এই কথার উপর সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত ও দণ্ডায়মান। তারপর আল্লাহর এই হুকুমকে এই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাবেন। তিনি হবেন মো'মেন। তার জীবন সম্পদ মানবতার কল্যাণে তিনি উৎসর্গ করবেন। এই মো'মেনের জন্যই হলো সওম, সালাহ, হজ্ব সবকিছু।

ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি যার প্রথমেই হচ্ছে তওহীদ অর্থাৎ কলেমা। তারপরে সালাহ, যাকাত, হজ্ব ও সর্বশেষ হচ্ছে সওম (আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বোখারী)। এখানে প্রথমটি হচ্ছে ঈমান আর বাকি সব আমল। যে ঈমান আনবে তার জন্য আমল। মানুষ জান্নাতে যাবে ঈমান

দিয়ে, আমল দিয়ে তার জান্নাতের স্তর নির্ধারিত হবে অর্থাৎ কে কোন স্তরে থাকবে সেটা নির্ভর করবে তার আমলের উপর। এই জন্যই রসুল (সা.) বলেছেন, "যে বললো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ সেই জান্নাত যাবে (আবু যর গিফারি রা. থেকে বোখারী মুসলিম)। তাহলে এখানে পরিষ্কার দুইটা বিষয় - ঈমান ও আমল। সওম হলো আমল। আর মো'মেনের জন্য এই আমল দরকার। তাহলে বিষয়টি পরিষ্কা যে মো'মেন সওম রাখবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন সওম রাখতে হবে, সওমের উদ্দেশ্য কী?

সওমের উদ্দেশ্য কী?

সওম শব্দের অর্থ বিরত থাকা অর্থাৎ আত্মসংযম (ঝবষভ ঈড়হঃৎড়ষ)। মো'মেন সারাদিন সওম রাখবে অর্থাৎ পানাহার ও জৈবিক চাহিদাপূরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, আত্মাকে করবে শক্তিশালী। সে অপচয় করবে না, মিথ্যা বলবে না, পশুর মতো উদরপূর্তি করবে না। সে হবে নিয়ন্ত্রিত, ত্যাগী, নিজের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গকারী এবং আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে সজাগ। নফসের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে তার মনকে, আত্মাকে শক্তিশালী করবে। মো'মেনের কেন মনের উপর নিয়ন্ত্রণের দরকার? সেটার উত্তরও এ আয়াতটির মধ্যেই রয়েছে, যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।

তাকওয়া অর্থ কী?

তাকওয়া হলো সাবধানে, সতর্কতার সাথে, দেখে শুনে জীবনের পথ চলা। আল্লাহর হুকুম যেটা সেটা মানা, আর যেটা নিষেধ সেটা পরিহার করা। এটা করতে হলে প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ থাকা আবশ্যক। যিনি তাকওয়া অবলম্বন করেন তিনি হলেন মোত্তাকী। আল্লাহর দৃষ্টিতে মো'মেনের মর্যাদার মাপকাঠি হচ্ছে এই তাকওয়া। যিনি প্রতিটি কাজে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, বৈধ-অবৈধ, ধর্ম-অধর্ম ইত্যাদি বিচার বিবেচনা করেন এবং সত্য, ন্যায়, হক ও বৈধপথ অবলম্বন করেন তিনি হলেন মোত্তাকী। যিনি যত বেশি ন্যায়সঙ্গত ও বৈধপন্থা অবলম্বন করবেন তিনি তত বড় মোত্তাকী। সুতরাং সওমের উদ্দেশ্য হলো মো'মেনকে মোত্তাকী করবে। তাকওয়া অর্জনে তাকে সহায়তা করবে। তাহলে মো'মেন জীবনের লক্ষ্য কী?

মো'মেন জীবনের লক্ষ্য কী?

নবী করিম (সা.) এর জীবনের লক্ষ্য ছিল, আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান মোতাবেক মানবজাতিকে পরিচালিত করে ন্যায়, সুবিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। এ জন্য এ দীনের নাম হলো ইসলাম, শান্তি। আল্লাহ বলেছেন, তিনি সঠিক পথনির্দেশ (হেদায়াহ) ও সত্যদীনসহ স্বীয় রসুল প্রেরণ করেছেন যেন রসুল (সা.) একে সকল দীনের উপর বিজয়ী হিসাবে প্রতিষ্ঠা

করেন (সুরা তওবা ৩৩, সুরা ফাতাহ ২৮, সুরা সফ ৯)। সেই সত্যদীনকে প্রতিষ্ঠা করার সর্ব উপায়ে প্রচেষ্টা চালানো প্রত্যেক মো'মেনের অবশ্য কর্তব্য, ফরদ। এই দীন প্রতিষ্ঠা করতে হলে মো'মেনের অবশ্যই কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, গুণ লাগবে। সেই চারিত্রিক, মানসিক, আত্মিক গুণ, বৈশিষ্ট্য (অঃঃৎরনঁঃবং) এটা যে সে অর্জন করবে কোত্থেকে অর্জন করবে? সেটার জন্য আল্লাহ তার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রেখেছেন। সেটা হলো সালাহ, সওম, হজ্ব, যাকাত এগুলো। এগুলোর মাধ্যমে তার চরিত্রে কিছু গুণ অর্জিত হবে। তারপর সে আল্লাহর সত্যদীন পৃথিবীময় প্রতিষ্ঠা করে মানবসমাজ থেকে অন্যায় অশান্তি দূর করতে পারবে, যেটা উম্মতে মোহাম্মদীর সৃষ্টির উদ্দেশ্য। যেমন একটি গাড়ির উদ্দেশ্য হচ্ছে তা মানুষকে বহন করে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে নিয়ে যাবে। এই গাড়ির প্রতিটি যন্ত্রাংশের (চধৎঃং) আবার ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকে। চাকার উদ্দেশ্য, পিস্টনের উদ্দেশ্য, সিটের উদ্দেশ্য, স্টিয়ারিং-এর উদ্দেশ্য, ইঞ্জিনের উদ্দেশ্য আলাদা আলাদা হলেও তাদের সবার সম্মিলিত উদ্দেশ্য হচ্ছে গাড়িটির এক স্থান থেকে আরেক স্থানে চলন (গড়াবসবহঃ)। গাড়িটি যদি অচল হয়, তাহলে এর যন্ত্রাংশগুলো আলাদা আলাদাভাবে যতই ভালো থাকুক লাভ নেই। তেমনি ইসলামের একটি সামগ্রিক উদ্দেশ্য আছে তা হলো - সমাজে শান্তি রাখা। মানব সমাজে যদি শান্তিই না থাকে তখন ইসলামের সব আমলই অর্থহীন। গাড়ির যেমন প্রতিটি যন্ত্রাংশের আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য থাকে তেমনি দীনুল হকের (ইসলাম) অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি বিষয়ের আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সবগুলো মিলিয়ে মূল লক্ষ্য এক ও অভিন্ন। যেমন সালাতের উদ্দেশ্য ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য ইত্যাদি মো'মেনের চরিত্রে সৃষ্টি, যাকাতের উদ্দেশ্য সমাজে অর্থের সুষম বণ্টন, হজ্বের উদ্দেশ্য মুসলিম উম্মাহর জাতীয় বাৎসরিক সম্মেলন। সমগ্র মুসলিম উম্মাহ বছরে একবার তাদের জাতীয় সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করবে এবং কেন্দ্রীয় নেতার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমাধান করবে। একইভাবে সওমও মো'মেনের চরিত্রে একটি নির্দিষ্ট শিক্ষা দিয়ে থাকে। কী সেই শিক্ষা?

সওম কী শিক্ষা দেবে?

তাহলে সওম মো'মেনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করবে। মানুষের নফস ভোগবাদী, সে চায় দুনিয়ার সম্পদ ভোগ করতে। আর মানবতার কল্যাণে কাজ করা, সত্যদীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা হচ্ছে ত্যাগের বিষয়, যা ভোগের ঠিক উল্টো। এটা করতে নিজেদের জান ও মালকে উৎসর্গ করতে হয়। ত্যাগ করার জন্য চারিত্রিক শক্তি, মানসিক বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে। মো'মেন সারা বছর খাবে পরিমিতভাবে যেভাবে আল্লাহর রসুল দেখিয়ে দিয়ে গেছেন এবং সে অপচয় করবে না, পশুর মতো উদরপূর্তি

করবে না। সেখানে একটি নিয়ন্ত্রণ থাকবে। কিন্তু বছরে এক মাস দিনের বেলা নির্দিষ্ট সময়ে সে খাবে না, জৈবিক চাহিদা পূর্ণ করবে না অর্থাৎ নিজের ইন্দ্রিয়কে, আত্মাকে এই ক্ষেত্রে সে নিয়ন্ত্রণ করবে। আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে সে সজাগ হবে। এটা করতে গিয়ে আল্লাহর হুকুম মানার জন্য তার যে শারীরিক কষ্ট, মানসিক কষ্ট সহ্য করার মানসিকতা তৈরি হবে এটা তার জাতীয়, সামষ্টিক ও সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হবে। আল্লাহর হুকুম মানার ক্ষেত্রে কষ্টদায়ক হলেও সে ভোগবাদী হবে না, পিশাচে পরিণত হবে না, সে নিয়ন্ত্রিত হবে, ত্যাগী হবে। সে আল্লাহর হুকুম অমান্যকারী হবে না, মান্যকারী হবে। তার ত্যাগের প্রভাবটা পড়বে তার সমাজে। ফলে এমন একটি সমাজ গড়ে উঠবে যেখানে সবাই একে অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে উৎসাহী, নিজে না খেয়ে অন্যকে খাওয়াতে আগ্রহী হবে। তাদের মধ্যে বিরাজ করবে সহযোগিতা, সহমর্মিতা। তাহলে সওমের মূল উদ্দেশ্যটাই হলো যে আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ। আমরা যদি সালাহকে (নামাজ) সামষ্টিক (ঈড়ষষবপঃরাব) প্রশিক্ষণ মনে করি তাহলে সওম অনেকটা ব্যক্তিগত (ওহফরারফঁধষ) প্রশিক্ষণ।

এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের সমাজে অধিকাংশ মুসলিমই সওম রাখছেন। কিন্তু সওমের যে শিক্ষা তা আমাদের সমাজে কতটুকু প্রতিফলিত হলো। আমরা যদি পৃথিবীতে শুধু মুসলমানদেরকে হিসাবের মধ্যে ধরি যারা আল্লাহ রাসুলকে বিশ্বাস করেন, কেতাব বিশ্বাস করেন, হাশর বিশ্বাস করেন এমন মুসলমান ১৫০ কোটির কম হবে না। আমরা দেখি রোজা যখন আসে মুসলিম বিশ্বে খুব হুলুস্থুল পড়ে যায়। ব্যাপক প্রস্তুতি চলতে থাকে ঘরে ঘরে। রেডিও টেলিভিশনে অনুষ্ঠান প্রচারিত হতে থাকে। ইসলামী চিন্তাবিদরা বড় বড় আর্টিকেল লিখতে থাকেন। বিভিন্ন ধরনের কলাম লেখা শুরু হয়। সওমের গুরুত্ব, মাহাত্ম্য, ইফতারের গুরুত্ব, সেহেরির গুরুত্ব। আবার কেউ কেউ সওয়াবের জন্য রাত জেগে সেহেরির জন্য মানুষকে জাগিয়ে থাকেন। কিন্তু আমাদের সওমটা সঠিক হচ্ছে কিনা, সেটা আল্লাহর দরবারে কবুল হচ্ছে কি হচ্ছে না এই ব্যাপারে আমাদেরকে অবশ্যই ভাবতে হবে। অনেকে মনে করেন আমার সওম কবুল হয় কি হয় না আল্লাহই জানেন। কিন্তু না, শুধু আল্লাহ জানবেন কেন, আপনিও জানবেন আপনারটা হবে কি হবে না। সেগুলোর কতগুলো মাত্রা আল্লাহ দিয়েছেন।

সওম কখন উপোস থাকা হবে?

নবী (সা.) বলেছেন, এমন একটা সময় আসবে যখন রোযাদারদের রোযা থেকে ক্ষুধা ও পিপাসা ব্যতীত আর কিছু অর্জিত হবে না। আর অনেক মানুষ রাত জেগে নামাজ আদায় করবে, কিন্তু তাদের রাত জাগাই সার

হবে (ইবনে মাজাহ, আহমাদ, তাবারানী, দারিমি, মেশকাত)।

ইসলামের প্রকৃত আকিদা বুঝতে হলে এই হাদিসটির প্রকৃত অর্থ বোঝা অতি প্রয়োজন। কেন রোজাদারদের রোজা হবে শুধু না খেয়ে ক্ষুধার্ত হয়ে থাকা অর্থাৎ রোযা হবে না এবং কেন রাত্রে তাহাজ্জুদ নামায পড়লেও সেটা শুধু ঘুম নষ্ট করা হবে, তাহাজ্জুদ হবে না। এই হাদিসে মহানবী (সা.) কাদের বোঝাচ্ছেন? হাজারো রকমের এবাদতের মধ্য থেকে মাত্র দু'টি তিনি বেছে নিয়েছেন। একটি রোযা অন্যটি তাহাজ্জুদ। এর একটা ফরদ-বাধ্যতামূলক, অন্যটি নফল- নিজের ইচ্ছাধীন। বিশ্বনবী (সা.) পাঁচটি বাধ্যতামূলক ফরয এবাদত থেকে একটি এবং শত শত নফল এবাদত থেকে একটি বেছে নেয়ার উদ্দেশ্য হল এই - মনস্তত্তের দিক দিয়ে আল্লাহ রসুল ও দীনের উপর পরিপূর্ণ ঈমান ছাড়া কারো পক্ষে এক মাস রোযা রাখা বা নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়া সম্ভব নয়। এমনকি মোকাম্মেল ঈমান আছে এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যারা তাহাজ্জুদ পড়েন না। অর্থাৎ রসুলাল্লাহ বোঝাচ্ছেন তাদের, যাদের পরিপূর্ণ দৃঢ় ঈমান আছে আল্লাহ-রসুল-কোর'আন ও ইসলামের উপর। এই হাদিসে তিনি মোনাফেক বা লোক দেখিয়ে করা যায় অর্থাৎ রিয়াকারীদের বোঝান নি। কারণ যে সব এবাদত লোক দেখিয়ে করা যায় অর্থাৎ মসজিদে যেয়ে নামায-হজ্ব-যাকাত ইত্যাদি একটিও উল্লেখ করেন নি। মোনাফেক রিয়াকারী বোঝালে তিনি অবশ্যই এগুলি উল্লেখ করতেন যেগুলি লোক দেখিয়ে করা যায়। তিনি ঠিক সেই দু'টি এবাদত উল্লেখ করলেন যে দুটি মোনাফেক ও রিয়াকারীর পক্ষে অসম্ভব, যে দু'টি লোকজন দেখিয়ে করাই যায় না, যে দুটি পরিপূর্ণ ঈমান নিয়েও সবাই করতে পারে না। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে এমন সময় আসবে যখন আমার উম্মতের মানুষ পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী হয়ে নামায-রোযা-হজ্ব-যাকাত-তাহাজ্জুদ ইত্যাদি সর্ববিধ এবাদত করবে কিন্তু কোন কিছুই হবে না, কোন এবাদত গৃহীত-কবুল হবে না। যদি দীর্ঘ এক মাসের কঠিন রোযা এবং মাসের পর মাস বছরের পর বছর শীত-গ্রীষ্মের গভীর রাত্রে শয্যা ত্যাগ করা তাহাজ্জুদ নিষ্ফল হয়, তবে অন্যান্য সব এবাদত অবশ্যই বৃথা। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যারা শুধু পরিপূর্ণ বিশ্বাসী অর্থাৎ মোকাম্মল ঈমানদারই নয়, রোযাদার ও তাহাজ্জুদী ও তাদের এবাদত নিষ্ফল কেন? তাছাড়া তাদের এবাদতই যদি বৃথা হয় তবে অন্যান্য সাধারণ মুসলিমদের এবাদতের কি দশা? মহানবীর (সা.) ঐ ভবিষ্যদ্বাণীর একমাত্র সম্ভব উত্তর হচ্ছে এই যে, তিনি যাদের কথা বলছেন তারা গত কয়েক শতাব্দী ও আজকের দুনিয়ার মুসলিম নামধারী জাতি। আল্লাহ ও তাঁর রসুল (সা.) এই জাতির সম্মুখে যে উদ্দেশ্য স্থাপন করে দিয়েছিলেন আকিদার বিকৃতিতে জাতি তা বদলিয়ে অন্য উদ্দেশ্য স্থাপন করে নিয়েছে।

কষ্ট করে রোজা রাখছেন, রোজার জন্য এত কিছু করছেন কিন্তু রোজা হবে না। কখন হবে না? এই রোজদারেরা যখন সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য নিরূপণ করে না, যখন তারা আল্লাহর হুকুম মানে না, আল্লাহ যা আদেশ দিয়েছেন তা তারা মানে না, আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তা তারা শোনে না। অর্থাৎ তারা আল্লাহর হুকুম থেকে বিচ্যুত, তওহীদ থেকে বহিষ্কৃত। তারা হবে স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক। এই অবস্থায় তাদের সওম হবে উপোস থাকা। লোক দেখানো, তাদের সওম হবে না। উপবাস অন্যান্য ধর্মের মধ্যেও আছে। তাহাজ্জুদ হবে ঘুম নষ্ট করা।

সমাজে সওমের প্রভাবঃ

এখন সমাজের মধ্যে সওমের কী প্রভাব পড়ার কথা ছিল? ব্যক্তির সমন্বয়ে সমাজ। আমরা যদি সত্যিকার রোজাদার হতাম, সংযমী হতাম, তাহলে একটা মুসলিমপ্রধান দেশে কীভাবে ১১ মাস খাদ্যদ্রব্যের দাম কমে আর রোজার মাস বাড়ে? রসুলাল্লাহ (সা.) এবং সাহাবী ও তাবে-তাবেয়ীনদের যুগে রমজান মাসে বাজার দর সবচেয়ে মন্দা যেত। পণ্যসামগ্রির চাহিদা থাকতো সবচেয়ে কম। তারা নিজের জন্য ভোগ্যপণ্য কেনাকাটা না করে ঘুরে ঘুরে গরীব দুঃখীদের দান সদকা করতেন। আর বর্তমানে রমজান মাস আসলেই চাল, ডাল, আটা, চিনি, লবণ, পেঁয়াজ, রসুন, তেল এগুলোর মূল্য ধাঁই ধাঁই করে বেড়ে চলে। অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। সংযমের কোনো চিহ্নই থাকে না, অন্য সময়ের চেয়ে খাওয়ার পরিমাণ ও ব্যয় বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ বলেছেন, যারা কুফরী করেছে তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং পশুর মত আহার করে। তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম (সূরা মোহাম্মদ ১২)।

সওমের মাসে যদি সতিকার অর্থে সংযম থাকতো তাহলে মুসলিম বিশ্বে দারিদ্র্য থাকতো না। একমাসের সওমই সমাজকে অনেকাংশে স্বচ্ছল করতে যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারতো। যারা অবস্থাসম্পন্ন তারা যদি সংযমী হতেন যে এই একটি মাস আমরা লোকদেখানো সংযম নয়, সত্যিকারভাবে সংযম করব, তাহলে যতটুকু তারা ব্যয় সংকোচন করছেন সেটা সমাজের মধ্যে উপচে পড়তো। পনেরো কোটি জনসংখ্যার মধ্যে পাঁচ কোটিও যদি সওম (সংযম) করে সেই ভোগ্যবস্তু অন্যকে দান করত তাহলে জাতীয় সম্পদ এমনভাবে উপচে পড়ত নেওয়ার লোক খুঁজে পাওয়া যেত না। এটা হচ্ছে সওয়মের বাস্তব প্রতিফলন। উদাহরণ যদি অন্যান্য মাসে ভোজ্য তেলের লিটার থাকতো ১০০ টাকা, এই মাসে থাকতো ২০ টাকা। অন্যান্য মাসে গোশত যদি থাকতো ২০০ টাকা এই মাসে থাকতো ৫০ টাকা। কারণ মানুষ নিজেদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে, চাহিদা থাকলেও খাচ্ছে না। সেই নিয়ন্ত্রণের প্রভাব তার শরীরের মধ্যে পড়বে, মনের মধ্যে পড়বে, এতে একদিকে ব্যক্তি পরিশুদ্ধ হবে, অন্যদিকে

সমাজ সমৃদ্ধ হবে। তাহলে প্রতি বছর মুসলিম বিশ্বে রোজা রাখা হচ্ছে, খাদ্যগ্রহণ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে, কিন্তু আমাদের সমাজে অন্যায় অবিচার, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ভয়ানক আকারে বেড়ে চলছে। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে আমাদের সওম হচ্ছে না। আইয়্যামে জাহেলিয়াতের ভোগবাদী সমাজ ইসলামের ছায়াতলে আসার পর কেমন পরিবর্তিত হয়েছিল সেটা ইতিহাস। যে সমাজে নারীকে ভোগ্যবস্তু মনে করা হতো, সেই সমাজে এমন নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে একজন যুবতী নারী একাকী সারা দেহে অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় শত শত মাইল পথ পরিভ্রমণ করত, তার মনে কোনো ক্ষতির আশঙ্কাও জাগ্রত হতো না। মানুষ নিজের উপার্জিত সম্পদ উট বোঝাই করে নিয়ে গ্রহণ করার মতো লোক খুঁজে ফিরত। শহরে না পেয়ে মরুভূমির পথে পথে ঘুরত, শেষে মুসাফিরদের সরাইখানাগুলোতে দান করে দিত। সামাজিক অপরাধ এত কমে গিয়েছিল যে আদালতগুলোয় মাসের পর মাস কোনো অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ আসতো না। সেই সোনালি যুগের কথা এখন অনেকের কাছে গল্পের মতো লাগতে পারে। আবু যার গেফারি (রা.) এর গেফার গোত্রের পেশাই ছিল ডাকাতি। সেই আবু যর (রা.) সত্যের পক্ষে আমৃত্যু লড়াই করে গেছেন। রাস্তায় কেউ সম্পদ হারিয়ে ফেলল খুঁজতে গিয়ে তা অবশ্যই ফেরত পাওয়া যেত। মানুষ সোনা-রূপার অলঙ্কারের দোকান খোলা রেখেই মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়ত, কেউ চুরি করত না। মানুষ জীবন গেলেও মিথ্যা বলত না, ওজনে কম দিত না। এই যে শান্তিপূর্ণ অবস্থা কায়েম হয়েছিল এটা কেবল আইন-কানুন দিয়ে হয় নি। মানুষের আত্মায় পরিবর্তন না আনতে পারলে কঠোর আইন দিয়ে মূল্যবোধ সৃষ্টি করা যায় না। যে সমাজের মানুষগুলো কিছুদিন আগেও ছিল চরম অসৎ তাদের আত্মায় এমন পরিবর্তন কী করে সম্ভব হয়েছিল? সেটা হচ্ছে এই সালাত, সওম ইত্যাদি চারিত্রিক প্রশিক্ষণের প্রভাব। সেই নামাজ রোজা তো আজও কম হচ্ছে না, তাহলে এর ফল নেই কেন?

তার কারণ সওম পালনের যে প্রথম শর্ত হচ্ছে তাকে মো'মেন হতে হবে। কিন্তু এই জাতি মো'মেন না। দ্বিতীয় শর্ত হচ্ছে, তাকওয়া, সত্যমিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় বোধের সৃষ্টি। আজকে অন্যান্য জাতির কথা বাদই দিলাম আমাদের মুসলমানদের মধ্যে ন্যায়-অন্যায় বোধের কোনো চিহ্ন নেই। এই বিষয়গুলা আজকে আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে, ভাবতে হবে। ভাবতে হবে এই জন্য যে আমরা মুসলমান ১৫০ কোটি। একের পর এক যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম দেশগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আমরা দিনকে দিন মসজিদ বানাচ্ছি, টাইল্‌সের মসজিদ হচ্ছে, এসি হচ্ছে, সোনার গম্বুজ হচ্ছে, আমাদের রোজাদারের কোনো অভাব নাই, হাজীর হজ্বের কমতি নেই, নামাজের কোনো অভাব নাই। এতেই বোঝা যায়

আমাদের নামাজ রোজাসহ অন্যান্য আমল কতটুকু গৃহীত হচ্ছে।

সমাজে সওমের আরেকটি প্রভাব পড়া উচিত ছিল যে মানুষ ক্ষুধার্তের কষ্ট অনুধাবন করবে। এটা কি আদৌ পড়ছে? যদি দেখা যায় যে বছরের অন্যান্য সময়গুলোতেও মানুষ এই বিষয়টা উপলব্ধি করে তার খাদ্য ক্ষুধার্তকে দিচ্ছে, প্রতিবেশিকে আহার করাচ্ছে তাহলে বোঝা যেত যে তার রমজানের সওম ফলপ্রসূ হয়েছে অর্থাৎ কবুল হয়েছে। তেমন কোনো নিদর্শন কিন্তু আমাদের সমাজে দেখা যায় না, তবে ব্যতিক্রম দু-চারজন ব্যক্তি থাকতেও পারে।

যে এগারো মাস ঘুষ খায় সে যদি এই একটি মাসে না খায় তাহলে তার একটি বিরাট প্রভাব সমাজে পড়ার কথা। কিন্তু আমরাতো এটা দেখি না, উল্টো এই মাসে অপরাধ আরো বাড়ে। এই মাসে খাদ্যে আরো বেশি বিষ মেশানো হয়। টাকার জন্য মানুষ মানুষকে এভাবে বিষ খাওয়াচ্ছে, সংযম তো দূরের কথা। এই মাসটিকে ব্যবসায়ীরা বাড়তি উপার্জনের মাস হিসাবে নির্বাচন করে। কথা ছিল সংযম কিন্তু রোজা শুরু হতে না হতেই দামী দামী পোশাক কেনা শুরু হয়। কথা ছিল এ মাসে আমি পোশাক কিনবো গরীব মানুষের জন্য, সে হিন্দু হোক বা মুসলিম। এক কথায় সে মানুষ কিনা, বনী আদম কিনা? ব্যাস, যার বস্ত্র নাই তাকে দেওয়া। কিন্তু কোথায় কী? যেখানে মুসলমানরা যখন অভাবের তাড়নায় ইউরোপের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করছে, শুধু অসহায় নারী নয়, পুরুষরা পর্যন্ত দেহব্যবসায় বাধ্য হচ্ছে সেখানে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে চলছে ইফতার আর ঈদের নামে খাদ্য ও সম্পদের বিপুল অপচয়। সওম তাদেরকে কোনো সংযমই শিক্ষা দিচ্ছে না। যেমন সালাহ তাদেরকে কোনো অন্যায় থেকে ফেরাতে পারছে না, ঐক্য-শৃঙ্খলা শিক্ষা দিচ্ছে না, তেমনি সওম পালন করেও চরিত্রে কোনো নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয় নি। এভাবেই আল্লাহর রসুলের হাদিসটি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে।

সওম সংক্রান্ত কিছু হাদীসঃ

সওমের উদ্দেশ্য কী? পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে তাকওয়া অর্জন অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায় পার্থক্য করার শক্তি। বাকি সবকিছুই হচ্ছে আনুষঙ্গিক। অথচ এই আনুষঙ্গিক বিষয়গুলোর উপরে হাজার হাজার ফতোয়া, মাসলা-মাসায়েলের কেতাব রচনা করা হয়েছে। ঐ রকম মাসলা-মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করা আমাদের পুস্তিকার লক্ষ্য নয়। একটি হাদিস আমরা প্রায়ই শুনি যে রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের সুগন্ধের চেয়ে উৎকৃষ্ট। (বুখারি, মুসলিম)। হ্যাঁ, এটা স্বীকার করি। কিন্তু তার থেকে শহীদের রক্ত আল্লাহর কাছে আরও বেশি প্রিয়। ইসলামের সবচেয়ে বড় মর্যাদাবান হচ্ছেন যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জীবন দিবেন। কোন রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহর কাছে প্রিয় সেটাও বুঝতে হবে।

রসুলাল্লাহ (সা.) তো এও বলেছেন যে একটা সময় আসবে যখন মানুষ রোজা রাখবে কিন্তু তা উপোস থাকা হবে, রোজা হবে না। এই রোজাদারের মুখের দুর্গন্ধ কি আল্লাহর কাছে প্রিয়? অবশ্যই নয়। কাজেই কোন সওম প্রকৃত সওম আর কোন সওম স্রেফ উপবাস সেটা লেখাই এই পুস্তিকার লক্ষ্য, মাসলা লেখার পুস্তিকা এটা নয়। সেহেরির দোয়া কী, ইফতারের দোয়া কী, কোন সময় সেহরি-ইফতার করতে হবে এগুলো হচ্ছে মাসলা। আজকে আমরা নিখুঁত রোজা রাখি, ঘড়ি ধরে বসে থাকি। আজান দেওয়ার এক সেকেন্ড আগেও ইফতার করি না, যেন রোজাটা নষ্ট না হয়। কিন্তু রোজা নষ্ট হয়ে গেছে বহু আগে। এটা এখন উপলব্ধি করতে হবে, সওমের আসল শিক্ষাটা সবাইকে ধারণ করতে হবে। আরেকটি হাদিস আছে যেখানে আল্লাহর রসুল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ আমাকে পাঁচটি কাজের আদেশ করেছেন। আমি তোমাদেরকে সেই পাঁচটি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করছি।

(১) তোমরা ঐক্যবদ্ধ হবে

(২) (নেতার আদেশ) শুনবে

(৩) (আদেশকারীর হুকুম) মান্য করবে

(৪) (আল্লাহর হুকুম পরিপন্থী কার্যক্রম থেকে) হেজরত করবে

(৫) আল্লাহর রাস্তায় জীবন-সম্পদ দিয়ে জেহাদ (সংগ্রাম) করবে।

যারা এই ঐক্যবন্ধনী থেকে এক বিঘত পরিমাণও দূরে সরে যাবে, তাদের গলদেশ থেকে ইসলামের বন্ধন খুলে যাবে যদি না সে তওবা করে ফিরে আসে। আর যে জাহেলিয়াতের কোনো কিছুর দিকে আহ্বান করে সে জাহান্নামের জ্বালানি পাথরে পরিণত হবে, যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এমন কি নিজেকে মুসলিম বলে বিশ্বাসও করে [হারিস আল আশয়ারী (রা.) থেকে আহমদ, তিরমিজি, বাব-উল-ইমারত, মেশকাত]।

আল্লাহপ্রদত্ত এই কর্মসূচি রসুলাল্লাহ (সা.) তাঁর উম্মাহকে দান করেছেন, সেই কর্মসূচি মোতাবেক উম্মতে মোহাম্মদী সংগ্রাম করে গেছেন এবং ন্যায়, সুবিচার, শান্তি, প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু আজ মুসলমান নামক জনসংখ্যা সেই ঐক্যবন্ধনীতে নেই। অথচ এ হাদিসটিতে বলা হয়েছে যারা এই কর্মসূচির ঐক্যবন্ধনী থেকে আধ হাতও সরে যাবে তদুপরি জাহেলিয়াতের দিকে আহ্বান করবে তারা জাহান্নামের জ্বালানি পাথরে পরিণত হবে, তারা যতই নামাজ পড়ুক, রোজা রাখুক এমন কি নিজেকে মো'মেন মুসলিম বলে বিশ্বাস করুক। অর্থাৎ তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে কাফের হয়ে যাবে। সাংঘাতিক গুরুত্বপূর্ণ হাদিস। খেয়াল করুন এখানে প্রথম ধারাটি হল ঐক্য অর্থাৎ তওহীদের উপরে ঐক্য। বর্তমানে এই মুসলিম দাবিদার জাতিটি শিয়া সুন্নি বিভিন্নভাবে বিভক্ত। রাজনৈতিক আর ধর্মীয়

মারামারি, যুদ্ধ, রক্তপাতে আমরা নিজেরা নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি, সত্য থেকে আধ হাত নয়, লক্ষ্য মাইল দূরে সরে গেছি। আমরা সারাদিন উপোস করছি আর ভাবছি সওম কবুল হচ্ছে, খুব সওয়াব হচ্ছে, অথচ সারা বিশ্বে অনাহারী ত্রাণশিবিরের বাসিন্দা মুসলিমদের ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করছি না। অনর্থক আমার দেহ শুকিয়ে লাভ কী? না, এটার মধ্যে কোনো মাহাত্ম্য নেই। বরং অন্য ভাইকে খেতে দিয়ে আমি যদি আমার দেহকে নিঃশেষ করি সেখানেই আমার মাহাত্ম্য। এজন্য আল্লাহ রসুল (সা.) বলেছেন, সওম তাদেরই হবে যারা মানবতার মুক্তির জন্য সংগ্রামের উদ্দেশ্যে ঐক্যবদ্ধ হবে। তাদের জাতির সামগ্রিক লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রতিটি সদস্যের ব্যক্তিগত চরিত্রের প্রশিক্ষণ হল সওম। যারা ঐ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ নয়, তাদের সওম অর্থহীন।

সওম নিয়ে বাড়াবাড়ি

রসুলাল্লাহর জীবনী ও হাদিস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় কখনও কখনও তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছেন। সেই সর্বরিপুজয়ী মহামানব কী কারণে রেগে লাল হয়ে গেছেন? রাসুল অক্লান্ত পরিশ্রম করে সমগ্র পৃথিবীতে আল্লাহর সত্যদীন প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে অপরাজেয় জাতি তথা উম্মতে মোহাম্মদী সৃষ্টি করলেন; সেই জাতি বিনাশী কর্মকাণ্ড তাঁর সামনে ঘটলে তিনি অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হতেন এবং ক্রোধান্বিত হওয়াটা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত। এই জাতিবিনাশী কাজগুলোর একটি হচ্ছে দীন নিয়ে বাড়াবাড়ি ও অতি বিশ্লেষণ।

একদিন আল্লাহর রসুলকে (সা.) জানানো হলো যে কিছু আরব সওম রাখা অবস্থায় স্ত্রীদের চুম্বন করেন না এবং রমজান মাসে সফরে বের হলেও সওম রাখেন। শুনে ক্রোধে বিশ্বনবীর (সা.) মুখ-চোখ লাল হয়ে গেলো এবং তিনি মসজিদে যেয়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে আল্লাহর হামদ বলার পর বললেন-সেই সব লোকদের কী দশা হবে যারা আমি নিজে যা করি তা থেকে তাদের বিরত রেখেছে? আল্লাহর কসম তাদের চেয়ে আমি আল্লাহকে বেশি জানি এবং বেশি ভয় করি (হাদিস-আয়েশা (রা.) থেকে বোখারী, মুশলিম, মেশকাত)। সফরে সওম রাখার কষ্টকর অবস্থা থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য আল্লাহ সওম রাখতে নিষেধ করেছেন এটা বান্দার প্রতি আল্লাহর রহমত। কিন্তু বাড়াবাড়ির আতিশয্যে যারা সফরেও কষ্ট করে সওম রাখা শুরু করলেন বিশ্বনবীর (সা.) ভর্ৎসনা শুনে তারা আবার ভারসাম্য ফিরিয়ে আনলেন। কিন্তু আজ এই জাতিকে কে বাড়াবাড়ি থেকে ফিরিয়ে আবার ভারসাম্যে আনবে? নবী তো আর আসবেন না, সুতরাং এ কাজ তাঁর প্রকৃত উম্মাহকেই করতে হবে।

একদিন একজন লোক এসে আল্লাহর রসুলের (সা.) কাছে অভিযোগ করলেন যে ওমুক লোক নামাজ লম্বা করে পড়ান, কাজেই তার (পড়ানো)

জামাতে আমি যোগ দিতে পারি না। শুনে তিনি (সা.) এত রাগান্বিত হয়ে গেলেন যে -বর্ণনাকারী আবু মাসউদ (রা.) বলছেন যে- আমরা তাকে এত রাগতে আর কখনও দেখি নি (হাদিস- আবু মাসউদ (রা.) থেকে বোখারী।)।

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোনো বিষয়ে মসলা জানতে চাইলে বিশ্বনবী (সা.) প্রথমে তা বলে দিতেন। কিন্তু কেউ যদি আরও একটু খুঁটিয়ে জানতে চাইতো তাহলেই তিনি রেগে যেতেন। কারণ তিনি জানতেন ঐ কাজ করেই অর্থাৎ অতি বিশ্লেণ ও ফতওয়াবাজী করেই তার আগের নবীদের জাতিগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে নিজেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। কিন্তু তাঁর অত ক্রোধেও অত নিষেধেও কোনো কাজ হয় নি। পরবর্তীতে তাঁর জাতিটিও ঠিক পূর্ববর্তী নবীদের (আ.) জাতিগুলোর মতো দীন নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করে অতি মুসলিম হয়ে মসলা-মাসায়েলের তর্ক তুলে বিভেদ সৃষ্টি করে হীনবল, শক্তিহীন হয়ে শত্রুর কাছে পরাজিত হয়ে তাদের গোলামে পরিণত হয়েছে।

সওমের ক্ষতিপূরণ আমাদের কী শিক্ষা দেয়

এক ব্যক্তি নবীর (সা.) নিকট এসে অনুতাপের সঙ্গে বলল, 'এই বদ-নসিব ধ্বংস হয়েছে।'

নবী জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কী হয়েছে?'

- আমি সওম থাকা অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে ফেলেছি।

- তোমার কি একজন ক্রীতদাস মুক্ত করার ক্ষমতা আছে?

- না;

- ২ মাস সওম থাকতে পারবে?

- না।

- ৬০ জন গরিবকে খাওয়াতে পারবে?

- না।

এমন সময় এক লোক বড় পাত্রভরা খেজুর নিয়ে আসলো। তখন নবী (সা.) ঐ ব্যক্তিকে বললেন, 'ঐ খেজুর নিয়ে যাও এবং স্বীয় গোনাহর কাফফারা হিসেবে সদকা দাও।'

সে বলল, এটা কি এমন লোককে দেব যে আমার চেয়ে অধিক গরিব? আমি কসম করে বলছি, আমার মতো গরিব এ এলাকায় আর কেউ নেই।'

তিনি এ কথা শুনে স্বভাবগত মৃদু হাসির চেয়ে একটু অধিক হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, তুমি তোমার পরিবারবর্গকেই খেতে দাও। (আয়েশা রা. থেকে বোখারী, ২য় খণ্ড-, ৮ম সংস্করণ; আ. হক,পৃ: ১৭৫)।

আল্লাহ মানুষকে কষ্ট দিতে চান না, পরিশুদ্ধ করতে চান। তাই তিনি ইসলামের ভিতরে যে কোনো বাড়াবাড়িকে হারাম করেছেন। সওম না রাখার জন্য তিনি কাউকে জাহান্নামে দিবেন বা শাস্তি দিবেন এমন কথা কোর'আনে কোথাও নেই। তবে মো'মেন সওম (সংযম সাধনা) না রাখলে তার আত্মিক অবনতি হবে, তার কাঙ্ক্ষিত চারিত্রিক গুণাবলী অর্জিত হবে না, সে স্বার্থপর হবে। সমাজের মানুষগুলো সমমর্মিতা, ত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত হবে না। ফলে সমাজ শান্তিদায়ক না হয়ে অশান্তিতে পূর্ণ থাকবে।

হাদিসটি থেকে আরেকটি শিক্ষা হচ্ছে সওম না রাখতে পারলে কাফফারা বা ফিদিয়া এমন যাতে সমাজ উপকৃত হয়, দারিদ্র্য দূর হয়। যেমন- দাসমুক্ত করা, দরিদ্রকে খাওয়ানো, সদকা দেওয়া ইত্যাদি। রমজান মাসে সদকা বা ফেতরা প্রদান করাও গুরুত্বপূর্ণ আমল যা মানুষের উপকারে আসে। এভাবে বিচার করলে দেখা যাবে ইসলামের উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজে শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়ন।

সওমের গুরুত্বের ওলট পালট

সওমের মাস আসলে যেভাবে ব্যাপক আয়োজন শুরু হয়, মনে হয় যেন সওমই ইসলামের একমাত্র কর্তব্য। গণমাধ্যমগুলো ক্রোড়পত্র বের করে, প্রতিদিন পত্রিকায় বিশেষ ফিচার, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখা শুরু হয়। টেলিভিশনে জাদরেল মাওলানা, মৌলভীরা আলোচনার ঝড় তোলেন। কিছু ডাক্তার আসেন সওমের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা বোঝাতে। সারারাত চলে হামদ ও নাত, শেষরাতে সেহেরি অনুষ্ঠান। সব মিলিয়ে বিরাট এক হুলুস্থুল পড়ে যায়। এটা অবশ্যই প্রশংসাযোগ্য, কারণ ইসলামের একটি বিষয় যত বেশি আলোচিত হবে, সেটা মানুষের জীবনেও তত বেশি আচরিত হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো যেখানে আল্লাহ কোর'আনে সওম ফরদ হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন মাত্র একবার (সুরা বাকারা ১৮৩) আর সওম পালনের নিয়ম কানুন উল্লেখ করেছেন পরবর্তী চারটি আয়াতে (সুরা বাকারা ১৮৪-১৮৭)। আর সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম তথা জেহাদ ফরদ হওয়ার কথা বলা হয়েছে বহুবার আর এর বিবরণ দেওয়া হয়েছে প্রায় পাঁচ শতাধিক আয়াতে। মো'মেনের সংজ্ঞার মধ্যেও আল্লাহ জেহাদকে অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, 'মো'মেন শুধুমাত্র তারাই যারা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি ঈমান আনার পর আর সন্দেহ পোষণ করে না এবং সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করে (সুরা হুজরাত ১৫)।' এ সংজ্ঞাতে আল্লাহ সওমকে অন্তর্ভুক্ত করেন নাই, জেহাদকে করেছেন। শুধু তাই নয়, সওম পালন না করলে কেউ ইসলাম থেকে বহিষ্কার এ কথা আল্লাহ কোথাও বলেন নি, কিন্তু জেহাদ না করলে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দিবেন এবং পুরো জাতিকে অন্য জাতির গোলামে পরিণত করবেন (সুরা

তওবা ৩৯)।

আল্লাহ যে বিষয়টি একবার মাত্র করার হুকুম দিলেও সেটা অবশ্যই ফরদ ও গুরুত্বপূর্ণ কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে বিষয়টি একইভাবে ফরদ করা হলো এবং সেই কাজের বিষয়ে শত শতবার বলা হলো সেটির গুরুত্ব আর দুই তিনটি আয়াতে যে বিষয়টি বলা হলো এই উভয় কাজের গুরুত্ব কি সমান? নিশ্চয়ই নয়। মহান আল্লাহ কোর'আনে শত শতবার জেহাদ কেতাল সম্পর্কে বলার পরও এ প্রসঙ্গে কেউ একটি শব্দও উচ্চারণ করেন না। মিডিয়াতে তো প্রশ্নই ওঠে না, এমন কি যে এমাম সাহেব মসজিদের মিম্বরে দাঁড়িয়ে সিয়ামের ফজিলত নিয়ে সুরেলা ওয়াজে শ্রোতাদের মোহিত করেন, ভুলেও জেহাদের নাম উচ্চারণ করেন না। এর কারণ আকিদার বিকৃতি ও ভয়।

এর কারণ কি? এর কারণ সওম অতি নিরাপদ একটি আমল যা করলে সুঁইয়ের খোঁচাও লাগার আশঙ্কা নেই। এতে জীবনের ঝুঁকি নেই, আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ারও সম্ভাবনা নেই, কোন কোরবানিরও প্রশ্ন নেই। পক্ষান্তরে জেহাদ এমন একটি কাজ যা করতে গেলে জীবন ও সম্পদের সম্পূর্ণ কোরবানি প্রয়োজন। আরেকটি কারণ হলো আজকের, দুনিয়াময় যে ইসলাম চালু আছে এটা আল্লাহ ও রসুলের ইসলাম নয়। ব্রিটিশরা মাদ্রাসা বসিয়ে নিজেরা সিলেবাস ঈঁৎৎরপঁষঁস তৈরি করে এই জাতিকে যে বিকৃত ইসলাম শিক্ষা দিয়েছে এটা সেই ইসলাম। এতে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব বা তওহীদ নেই, দীনুল হক প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম নেই, কোনো জাতীয় আইন-কানুন নেই, দণ্ডবিধি, অর্থনীতি নেই; অর্থাৎ নামাজ, রোজা আর ব্যক্তিগত আমলসর্বস্ব অন্যান্য ধর্মের মতোই একটি ধর্মে পরিণত হয়েছে। এই ধর্মের পণ্ডিতদের, আলেমদের কাছে দীনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে নামাজ, রোজা, দাড়ি, তারাবি, টুপি, টাখনু, মিলাদ, মেসওয়াক ইত্যাদি আর জেহাদ একেবারেই নিস্প্রয়োজন। এজন্য তাদের এই ইসলাম একটি মৃত, আল্লাহর রসুলের ইসলামের বিপরীতমুখী ধর্ম। এই বিকৃত ধর্মের উপাসনা ও আনুষ্ঠানিকতাগুলো মানুষ পালন করে আল্লাহর কাছ থেকে বিনিময় ও জান্নাত পাওয়ার আশায়। পবিত্র রমজান মাসে এই সমস্ত আমলের প্রতিদান অন্য সব মাসের চেয়ে সত্তর গুণ হবে এই আশায় ধর্মপ্রাণ মানুষ ফরদ, ওয়াজেব, সুন্নাহ, নফল, মোস্তাহাব ইত্যাদি সর্বপ্রকার আমল প্রচুর পরিমাণে করে থাকেন এবং এর বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করছেন বলে পরিতৃপ্ত থাকেন। কিন্তু সেই আমল গৃহীত হবে কী করলে সেটা কেউ ভেবে দেখে না। তওহীদহীন ইসলাম আল্লাহর কাছে গৃহীত নয় ফলে জাতিগতভাবে আমাদের মো'মেন থাকা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে। আরেকটি মারাত্মক বিষয় হচ্ছে গুরুত্বের ওলটপালট। আল্লাহ এবং তাঁর রসুল যে বিষয়ের অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন,

এই বিকৃত ইসলামে তাকে একেবারে গুরুত্বহীন করে ফেলা হয়েছে; পক্ষান্তরে আল্লাহ-রসুল যে কাজের গুরুত্ব দিয়েছেন কম, সেটিকে মহাগুরুত্বপূর্ণ বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

জেহাদ সংক্রান্ত আলোচনা না করায় কী ক্ষতি হচ্ছে?

জেহাদ সংক্রান্ত আলোচনা কোর'আন ও হাদিসের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। এটা নিয়ে যখন মিডিয়া, রাষ্ট্র এমনকি আলেম সমাজ, মসজিদের ইমামগণ প্রায় নিরব ভূমিকা পালন করেন তখন জেহাদের সঠিক আকিদা সাধারণ মানুষ জানতে পারে না। জেহাদ যে আসলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, জেহাদ এবং সন্ত্রাস যে ভিন্ন বিষয়, জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড ও জেহাদ যে সম্পূর্ণ বিপরীত- এ বিষয়গুলো সাধারণ মানুষের অজানাই থেকে যায়। এই অজ্ঞতার সুযোগই নেয় জঙ্গিরা। ধর্মপ্রাণ মানুষদেরকে জেহাদের আয়াত ও হাদিস দেখিয়ে নিজেদের দলে টেনে নেয়। তাদেরকে বোঝানো হয়- দেখ, দেখ জেহাদের কত গুরুত্ব, কত মাহাত্ম্য অথচ তোমার মসজিদের ইমাম তো কখনোই এই কথাগুলো তোমাকে শেখায় নি। তখন ধর্মপ্রাণ মানুষ এটাতে উদ্বুদ্ধ হয়। এজন্য সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষকে জেহাদ সংক্রান্ত আকিদা পরিষ্কার করা প্রয়োজন, তাদেরকে বোঝানো দরকার যে, জেহাদ এক বিষয় আর জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস অন্য বিষয়। কাজেই ইসলামে জেহাদ এর মানে কী, কেন জেহাদ করবে, কার বিরুদ্ধে করবে, কী দিয়ে করবে ইত্যাদি শিক্ষা ধর্মপ্রাণ মানুষকে দিতেই হবে। এটা এখন সময়ের দাবি।

তারাবির সালাতের গুরুত্ব কতটুকু?

তারাবি সালাহ আসলে কী, ইসলামে এর স্থান কোথায় তা নিয়ে বিস্তর মতভেদ আলেমদের মধ্যে আছে। কিছু সাধারণ সত্য মুসল্লিদের জানা থাকা প্রয়োজন। বর্তমানে সওমের মাসে প্রতি রাত্রে ২০ রাকাত তারাবির সালাতকে সওমের অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা হয়, এমন ধারণা করা হয় যেন তারাবি না পড়লে সওমই হবে না, এমনকি কেউ যদি সওম নাও রাখে তবু তার তারাবি পড়া উচিত। তাই বাস্তবে দেখা যায়, যারা ফরদ সালাহর ব্যাপারে গাফেল, তারাও তারাবির ব্যাপারে সতর্ক। কিন্তু ফকীহরা তারাবিকে সুন্নাতে মোয়াক্কাদার বেশি বলেন নি। আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে, কোর'আনে বা হাদিসে তারাবি শব্দটিই নেই। আকিদার বিকৃতি ছাড়াও তারাবির এত গুরুত্ব দেওয়ার পেছনে অর্থনৈতিক বিষয়টিই প্রধান। অথচ মওলানা রশিদ আহমেদ গাঙ্গুহী (র.), মওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.), মওলানা খলিল আহমেদ সাহারানপুরী (র.), মুফতি আজিজুর রহমান (র.) প্রমুখ প্রখ্যাত আলেম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, অর্থের বিনিময়ে খতম তারাবি পড়ানো হারাম।

নবী করিম (সা.) এর উপর যখন কোর'আন নাজিল হয়েছিল তখন ঐ সব

আয়াত গাছের বাকলে, পাতায়, পাথরের উপরে, পশুর চামড়ায় ইত্যাদির মধ্যে লিখে রাখতে হতো, আজকের মতো মুদ্রণযন্ত্র ছিল না, কাগজে লেখার এত প্রচলন ছিল না। সারা বছর যা নাজেল হত হুজুর পাক (সা.) সেগুলো ঝালাই বা চর্চা করতেন পবিত্র সওমের মাসে, কারণ সওমের মাসেই কোর'আন নাজেল হয়েছিল। এজন্য হুজুর (সা.) সওমের মাসে নির্দিষ্ট সময় ঠিক করতেন তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ থেকে ঐ সারা বছর যেগুলো নাজেল হয়েছে সেগুলোকে তিনি ঝালিয়ে নিতেন, যেন হারিয়ে না যায়। এতে হুজুরের (সা.) অনেক কষ্ট হত। প্রিয় হাবিবের কষ্ট দূর করার জন্য একদিন আল্লাহ আয়াত নাজেল করলেন, হে রসুল (সা.) আপনি আর কষ্ট করবেন না আমি এটা সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছি (সুরা আলা ৬, সুরা হিজর ৯, সুরা কেয়ামাহ ১৬-১৭)। তারপর থেকে রসুলাল্লাহ (সা.) ভারমুক্ত হন।

রসুলাল্লাহর (সা.) আসহাবদের অনেকেই সম্পূর্ণ কোর'আন কণ্ঠস্থ করে রাখতেন। যারা মুখস্থ করে রাখতেন অর্থাৎ হাফেজে কোর'আন, তারা যেন তা না ভুলে যান সেজন্য চর্চা অব্যাহত থাকতো। কিন্তু বর্তমান যুগে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি কোর'আন শরিফ, প্রায় প্রতিটি ভাষায় রয়েছে এর অনুবাদ। তথ্য প্রযুক্তির অগ্রগতির কারণে আল্লাহর রহমে কোর'আন হারিয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কোর'আন শরীফ আল্লাহর আদেশ-নিষেধের একটি গ্রন্থ। সেই আদেশ নিষেধকে সমাজে প্রতিষ্ঠা না করে, পশ্চিমা সভ্যতার আইন-কানুন মেনে নিয়ে রোজার মাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু কোর'আন শরিফ তেলাওয়াত করা আর শোনার কোনো মাহাত্ম্য নেই। এ কাজে সওয়াব হবে তখনই যখন তা মানবজীবনে প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং মানুষ এ থেকে উপকৃত হবে। যে কেতাব জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত নেই, সমাজে যেটার হুকুম ও শিক্ষা চলে না, সেই কেতাব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুখস্থ শোনার কী তাৎপর্য? এখন মুখস্থ করার থেকে বেশি জরুরি হলো একে প্রতিষ্ঠা করা। রসুলের (সা.) সাহাবীরা কোর'আন মুখস্থও করেছেন, একে জাতীয় প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শহীদও হয়েছেন। শুধু ইয়ামামার যুদ্ধেই সাতশ জন হাফেজে কোর'আন শহীদ হয়েছিলেন।

নিঃসন্দেহে কোর'আনে হাফেজ আল্লাহর কাছে সম্মানিত কিন্তু এর হক আদায় না করলে তিনি সেই সম্মান থেকে বঞ্চিত হবেন। আর কোর'আন দ্বারা অর্থ হাসিল করার তো প্রশ্নই আসে না। কারণ আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন 'যারা আয়াতের বিনিময়ে পার্থিব মূল্য গ্রহণ করে তারা আগুন ছাড়া কিছুই খায় না' (সুরা বাকারা ১৭৪)।

তারাবি সম্পর্কে মাত্র তিন থেকে চারটি হাদিস পাওয়া যায়। গভীর রাতে রসুলাল্লাহ সব সময়ই অতিরিক্ত সালাহ করতেন, একে 'কিয়াম আল লাইল' বলা হয় যা বিশেষভাবে তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক ছিল। তিনি ব্যক্তিগত সালাহ কায়েমের জন্য মসজিদের নিকটেই একটি ছোট ঘর তৈরি করেছিলেন। রমাদান মাসে তিনি এশার পর পরই নিজ গৃহে এই সালাহ

কায়েম করে ফেলতেন এবং অন্যান্য সময়ের চেয়ে সালাহ দীর্ঘ করতেন। দীর্ঘ করার উদ্দেশ্য ছিল মূলতঃ কোর'আনের মুখস্থ আয়াতগুলো ঝালিয়ে নেওয়া। একবার রমাদান মাসে তিনি এশার পরে নফল সালাহ কায়েম করছেন। বাইরে থেকে তাঁর ক্বেরাতের আওয়াজ শুনে কয়েকজন সাহাবী ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েই রসুলের (সা.) সাথে জামাতে শরীক হয়ে যান। পরদিন এই সংবাদ পেয়ে আরো বেশ কিছু সাহাবী আসেন রসুলের (সা.) সাথে সালাহ কায়েম করার জন্য। কিন্তু সেদিন আর রসুলাল্লাহ সালাতে দাঁড়ান না এবং ঘরের বাইরেও আসেন না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে আসহাবগণ উচ্চস্বরে রসুলাল্লাহকে ডাকতে থাকেন এবং তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ঘরের দরজায় ছোট ছোট পাথর ছুঁড়ে মারতে থাকেন। তাঁদের এ আচরণে রাগান্বিত হয়ে রসুলাল্লাহ বেরিয়ে এসে বলেন, 'তোমরা এখনও আমাকে জোর করছো? আমার আশঙ্কা হয় এই সালাহ তোমাদের জন্য আল্লাহ না ফরদ করে দেন। হে লোকসকল! তোমরা এই সালাহ নিজ নিজ ঘরে গিয়ে কায়েম করো। কারণ কেবলমাত্র ফরদ সালাহ ব্যতীত তোমাদের জন্য সর্বোত্তম সালাহ হচ্ছে সেই সালাহ যা নিজ গৃহে কায়েম করা হয়।" (যায়েদ বিন সাবিত রা. থেকে বোখারী)। আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান থেকে বর্ণিত, তিনি আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞাসা করেন, রমাদান মাসে রসুলাল্লাহর সালাহ কেমন ছিল। তিনি বলেন, রসুলাল্লাহ রমাদান মাসে এবং অন্যান্য সময়ে রাতে এগারো রাকাতের বেশি সালাহ কায়েম করতেন না। তিনি চার রাকাত সালাহ করতেন, আবার চার রাকাত সালাহ করতেন (অর্থাৎ আট রাকাত), এবং তারপরে তিন রাকাত সালাহ (বেতর) করতেন (বোখারী)।

এরপর রসুলের জীবদ্দশায় জামাতে এই সালাহ তিনদিনের বেশি কায়েম করার ইতিহাস নেই। প্রথম খলিফা আবু বকরের (রা.) সময়েও তারাবিহ সালাহ কায়েমের কোনো নজির নেই। তাহলে আজ এত গুরুত্বের সাথে প্রায় বাধ্যতামূলক তারাবি পড়ার প্রচলন হলো কিভাবে? এর প্রকৃত কারণ হচ্ছে আকিদার বিকৃতি হয়ে ইসলামের ছোট বিষয়গুলোকে মহা গুরুত্বপূর্ণ করে ফেলা। আবার মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে একেবারে গায়েব করে দেওয়া যেমন তওহীদ, জেহাদ (সত্যদীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম), আইন-কানুন, অর্থনীতি, দণ্ডবিধি ইত্যাদি ব্যাপারে খবরও নেই, আগ্রহও নেই। সুতরাং সুন্নত হিসাবে মো'মেনরা তারাবি পড়তে পারেন কিন্তু একে বাধ্যতামূলক বানিয়ে নেওয়াটা বাড়াবাড়ি।

পরিশেষে কথা হচ্ছে এ ছোট পুস্তিকায় সওমের প্রকৃত আকিদা, উদ্দেশ্য তুলে ধরতে যথাসাধ্য চেষ্টা করলাম, পারলাম কিনা জানি না। আমি যে কথাটি বোঝাতে চেয়েছি তা হলো, সওম হচ্ছে এমন একটি আমল যা ব্যক্তিকে আল্লাহর হুকুম মানার জন্য মানসিক ও আত্মিকভাবে প্রস্তুত করে। সওমের দ্বারা যে আল্লাহর হুকুম মান্য করা শিখবে না, তার সওম রাখা না রাখা সমান কথা। বর্তমানে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে আজ এটাই হচ্ছে।